INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আলোকে: প্রাণীর নৈতিক মর্যাদা সংক্রান্ত বিতর্কের পর্যালোচনা

***সৌরভ মহান্ত**

https://doi.org/10.5281/zenodo.21051694

সারসংক্ষেপ

পরিবেশ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা বহু প্রাচীনকাল থেকে আলোচিত হলেও বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে তা নতুন রূপ ধারণ করে। পরিবেশ সম্পর্কে চিরাচরিত ভাবনায় মানুষকে পরিবেশের কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। অর্থ্যাৎ মানুষ তার প্রয়োজনে পরিবেশ তথা প্রাণীকুলকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে পারে। এই মানবকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনার সবথেকে আপত্তিকর ও ভয়াবহ দিকটি হল প্রজাতিবাদ এবং স্বাজাত্যাভিমান। প্রজাতিবাদ হল আমাদের নিজস্ব প্রজাতির সদস্যদের স্বার্থে এবং অন্য প্রজাতির সদস্যদের স্বার্থের বিপক্ষে একধরনের পক্ষপাতিত্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণ। তার সঙ্গে যে বিষয়টি বহু চর্চিত তাহলো অ-মনুষ্যতর প্রাণীর নৈতিক মর্যাদা কতটা এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। এই বিষয়টিকে মাথায় রেখে প্রাণীর নৈতিক মর্যাদা বিষয়ক সমস্যাটি বর্তমান সময়ে মাথাচড়া দিয়ে উঠেছে। তবে বাস্তুতন্ত্রের মূল চিন্তাভাবনা নিহিত আছে সমগ্রতাবাদী ধানধারনের মধ্যে। কারণ বাস্তুতন্ত্র হলো এক জটিল জাল, যেখানে প্রত্যেকটি সত্তা একে অপরের সঙ্গে আন্তর সম্পর্কে যুক্ত। প্রত্যেক সত্তা তাই অপর সত্তার উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। সেখানে স্বার্থকেন্দ্রিকভাবে বাস করা কখনো সম্ভব নয়।

সূচকশব্দ: মানবকেন্দ্রীকতাবাদ, প্রজাতিবাদ, মানবীয় স্বাজাত্যাভিমান, নৈতিক মর্যাদা, বাস্তুতন্ত্র, অ-মনুষ্যতর ।

**Independent Research Scholar, Department of Philosophy, University of Burdwan*

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

ভূমিকা:

সম্প্রতিকালে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে পরিবেশ নীতিবিদ্যার আলোচনা অপেক্ষাকৃত জটিল। কারন, আলোচিত এইসব বিষয় সমূহ বিভিন্ন সময় আমাদের অনেক নৈতিক প্রশ্নের সম্মুখীন করে তোলে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে, মানবেতর প্রানীর প্রতি মানুষের নৈতিক বিবেচনার বিষয়টি। বহুকাল আগে থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দার্শনিক মহলে আলোচনা হয়ে আসছে। তবে প্রথম সাড়া জাগানো আলোচনা হয় বিংশ শতাব্দির সত্তরের দশকে যা পরবর্তীকালে আন্দোলনে রূপলাভ করে। পরিবেশ নীতিশাস্ত্রের যে শাখাই মানুষের হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রাণীর স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠা, বিচরণ করা এবং প্রাণীর স্বগত মূল্য স্বীকার করা হয়, তাকেই প্রাণী নীতিবিদ্যা বলে। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত দার্শনিকরা মনে করতেন প্রাণীরা মানুষের তুলনায় যথেষ্ট পৃথক। মানুষের যুক্তিবুদ্ধি আছে যেখানে মানবেতর প্রাণীর মধ্যে কোন যুক্তিবুদ্ধি নেই। সুতরাং বলা যায়, প্রাণীর কেবলমাত্র যান্ত্রিক মূল্য বা সহায়ক মূল্য আছে এবং মানুষের ইচ্ছামত তাদের ব্যবহার করার অধিকার আছে। পরবর্তীকালে দার্শনিকরা উপলব্ধি করেছেন যে মানুষ ও প্রাণীর মধ্যেকার এই পার্থক্য ততটা সুস্পষ্ট নয়। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে জেরেমি বেন্থাম প্রথম দেখান যৌক্তিকতা নৈতিকতার গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড নয়।

প্রাণীর নৈতিক মর্যাদা সংক্রান্ত বিতর্ক:

পশুরাও আহত হয় এবং এটাই আসল বিষয়, প্রাণীর স্বগত মূল্য আছে। ঊনবিংশ শতকের সময় প্রাকৃতিক নির্বাচনের মূল্যায়নের দ্বারা ডারউইনের তত্ত্বের অংশ হিসেবে দেখা গিয়েছিল যে দুঃখের অবস্থা ও আনন্দের অবস্থাগুলিও অভিযোজিত হতে পারে। আমাদের গতানুগতিক নৈতিক বিচারধারা কেবলমাত্র মানুষেরই নৈতিক মর্যাদা স্বীকার করে এবং মনে করা হয় নৈতিক বিবেচ্যতা পাওয়ার যোগ্য একমাত্র মানুষ। তথাকথিত এই ধারাবাহিক বিচারধারা অমানব প্রাণীকুলের নৈতিক মর্যাদা স্বীকারের পক্ষপাতী নয়।

এখন প্রশ্ন হল, মানবেতর প্রাণী বলতে আসলে আমরা কোন প্রজাতি কে বুঝি আর তাদের অধিকার বলতে কী বুঝি? আমরা জানি, মানুষ ছাড়া এই পৃথিবীতে অসংখ্য প্রাণের অস্তিত্ব বিদ্যমান। এইসব প্রাণীর চেতনা থাকলেও বোধশক্তি বা ভালো মন্দ বোঝার ক্ষমতা বেশীরভাগেরই নেই। এদের আমরা মানবেতর প্রানী বলে থাকি। মানুষ তাদের নিজেদের প্রয়োজনে এ সমস্ত প্রাণীদের ব্যবহার করে বা তাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক আচরণ করে থাকে যা আসলেই কাম্য নয়। কারন প্রাণীদের অধিকার আছে, মূল্য আছে যেভাবে অন্য সত্তার অধিকার ও মূল্য রয়েছে। এই অধিকার হলো একপ্রকার দাবী, যে দাবীতে তারা ক্ষতিগ্রস্তহীনভাবে বাঁচার প্রত্যাশা করতে পারে। এই অধিকারের বলে প্রাণীরাও নৈতিক মূল্যে মূল্যবান বলে প্রাণী অধিকারের প্রবক্তাগণ মনে করে থাকে।

প্রাচীন দার্শনিক সমাজে প্রানীদের নৈতিক মর্যাদা সংক্রান্ত দুই ধরনের মতাদর্শ পাওয়া যায়। যথা- নীতিদায় শূন্যতা তত্ত্ব বা No Obligation Theory এবং নীতিদায় সংক্রান্ত তত্ত্ব বা Obligation Theory. এই নীতিদায় সংক্রান্ত তত্ত্ব আবার দুই ধরনের। যথা- প্রত্যক্ষ নীতিদায় তত্ত্ব বা Direct Obligation Theory, এবং পরোক্ষ নীতিদায় তত্ত্ব বা Indirect Obligation Theory. No obligation theory-তে বলা হয়েছে মানুষের প্রাণীজগতের প্রতি কোনো দায়দায়িত্ব নেই। এখানে মানবেতর জগতকে প্রাণবান যন্ত্র হিসেবে দেখা হয়েছে। প্রাণী জগতের প্রতি মনুষ্য জগতের কোনো দায়বদ্ধতা নেই। এইরকম ভাবনা কেবল সাধারণ মানুষদের মধ্যে ছিল না, দার্শনিক দের মধ্যেও ছিল। যেমন দেকার্ত, বেকন ইত্যাদি দার্শনিক প্রাণীর প্রতি কোনো নীতিদায় স্বীকার করেননি। প্রত্যক্ষ নীতিদায় হল মানুষ পরিবেশ ও প্রাণীজগতের প্রতি তার যে নৈতিক দায় বা নীতিদায় আছে সেটা স্বীকার করেন। যেমন-

পিটার সিঙ্গার, টম রেগান প্রমুখরা প্রাণীর প্রতি প্রত্যক্ষ নীতিদায় স্বীকার করেছেন। আর পরোক্ষ নীতিদায় তত্ত্বে বলা হয়েছে-প্রাণীজগতের প্রতি মানুষের পরোক্ষ নীতিদায় আছে। পরোক্ষ নীতিদায় বলতে, পশুদের সাথে ভালো আচরণ করার জন্য আমরা শুধুমাত্র নিজের কাছেই দায় থাকি, আমাদের দায় সরাসরি পশুদের সাথে থাকে না এবং আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থে তাদেরকে প্রয়োজনের সামগ্রীরূপে দেখি।

আধুনিক দর্শনের জনক ফরাসী দার্শনিক রেনে দেকার্ত মানুষকেই একমাত্র সচেতন সত্তা হিসেবে মনে করেন কারণ মানুষের দেহ এবং মন আছে। তাঁর মতে প্রাণী সচেতন সত্তা নয় কারণ প্রাণীর মন নেই। তাই প্রাণীর নৈতিক অধিকার থাকতে পারে না এমনকি প্রাণীর প্রতি মানুষের কোনো নৈতিক দায়বদ্ধতাও নেই। আমরা আমাদের চিন্তা ভাবনা প্রকাশের জন্য ভাষা বা বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করে থাকি যেটা প্রাণীরা করতে পারে না। আর তাই তিনি প্রাণীকে স্বয়ংক্রিয় যান্ত্রিক সত্তা (automate) হিসেবে অভিহিত করেছেন। মানুষ যেমন বিভিন্ন কাজের প্রয়োজনে যন্ত্র তৈরি করে তেমন যন্ত্র হচ্ছে প্রাণী তবে তা ঈশ্বরের তৈরি। তিনি মনে করেন মানুষ সচেতন সত্তার সাথে সাথে বুদ্ধিসম্পন্ন কারণ মানুষ তাদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ড এমন কারোর সামনে দেখাই না যে তার কর্মকাণ্ডকে বিচার করবে। আর মানুষের দেহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে গতিশীল যন্ত্র নয়, মানুষের মন এবং চিন্তা করার ক্ষমতা আছে। তবে এটা অনেক বেশি চমৎকারিত্বের দাবি রাখে যে, মন সর্বদা মানব দেহে খুঁজে পাওয়া যায় আর যা প্রত্যেক প্রাণীদেহে অবস্থিত।

জার্মান বিচারবাদী দার্শনিক ইমান্যুয়েল কান্ট মানুষের অবস্থানকে অনেক ওপরে রেখেছেন। তিনি মনে করেন সব ধরনের অধিকার মানুষের ওপরেই আরোপযোগ্য। ভালোত্ব বা মন্দত্ব বিচারে নয় বরং মানুষ হওয়ার জন্য মানুষের স্থান জগতের সকল প্রাণীর ওপরে। মানুষের মতো প্রাণীর স্বাধীন ঈচ্ছা থাকতে পারে না কারণ প্রানী আত্মসচেতন নয়। তাঁর মতে, স্বগত মূল্য থাকতে পারে, চেতনা শক্তি, নৈতিক বিচারের ক্ষমতা, ইত্যাদি থাকতে হয় যা প্রাণীর নেই। তিনি প্রাণীদের প্রতি পরোক্ষ নীতিদায় স্বীকার করেছেন। কান্ট প্রাণীদের পরত মূল্য স্বীকার করেছেন অর্থাৎ উপায় হিসেবে দেখেছেন। কিন্তু মানুষকে দেখেছেন উদ্দেশ্য হিসেবে। কারন মানুষ এর মর্যাদা সবার উপরে আর এজন্য মানুষেরই একমাত্র নৈতিক মূল্য আছে।

ডেভিডসন তাঁর "Inquiries into Truth and Interpretation" গ্রন্থে বলেন, ভাষা হচ্ছে অন্যের চিন্তা চেতনা বোঝানোর মাধ্যম। ভাষার মাধ্যমে আমরা আমাদের মনের ভাব চিন্তা প্রকাশ করি। ভাষা ছাড়া আমরা আমাদের মনের ভাব আদান প্রদান করতে বা ভালো মন্দের পার্থক্য করতে পারবো না। একটি শিশুকে যেমন কোনোকিছু ভাঙ্গার জন্য দায়ী করতে পারবো না তেমনি বোন কে আঘাত করার জন্য নিন্দা করা যাবে না। প্রাণীরা নৈতিক কর্তা নয়, তাদের কোন নৈতিক পছন্দ নেই বা নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহনেও সক্ষম নয়। তাই, মানবেতর প্রাণীর নৈতিক মূল্য নেই।

অ্যারিস্টটলের মতে, যৌক্তিক ক্ষমতা হল অন্য সকল ক্ষমতার চেয়ে সর্বোৎকৃষ্ট এবং এটিই মানুষকে অন্য সকল প্রাণীর ওপর স্থান দেয়। তিনি একটি মহাণ অনুক্রমিক কাঠামো দিয়েছেন, বেশী যুক্তিযুক্ত ব্যক্তিরা কম যুক্তিযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়ন্ত্রন করবে। যেমন পুরুষরা নারীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, গ্রীক জাতি অন্য জাতিদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ, মানুষ জাতিরা অন্য মানবেতর জাতিদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। এই কাঠামো অনুযায়ী, মানুষের পরম কর্তৃত্ব রয়েছে অন্যান্য সমস্ত প্রাণীদের ওপর এবং তাদের সাথে মানুষ যা ঈচ্ছে তাই করতে পারে। তিনি প্রাণীদের একরকম প্রানবান যন্ত্র হিসেবেই দেখতেন।

আমেরিকান দার্শনিক কার্ল কোহেন মনে করেন, প্রাণীদের কোনো অধিকার নেই কারণ প্রাণীরা নৈতিক বিচারের ক্ষমতা রাখে না। কিন্তু মানুষের নৈতিক বিচারের ক্ষমতা আছে এমনকি বিচার বিবেচনাও করতে পারে। মানুষ নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য আর যা নৈতিক

নিয়ম দ্বারা পরিচালিত। তাই মানুষের নৈতিক অধিকার রয়েছে কিন্তু প্রাণীর এইসব অধিকার নেই। এজন্য প্রাণীরা নৈতিক সম্প্রদায়ের সদস্য নয়। তাই যদি কোনো গবেষণা কাজে প্রাণীকে ব্যাবহার করা হয় তবে অধিকার লঙ্ঘন হবে না কারণ প্রাণীর লঙ্ঘিত হওয়ার মতো কিছু নেই। কোহেন মনে করেন, প্রাণীদের প্রতি আমাদের দায় দায়িত্ব আছে যেমনটা একজন ডাক্তারের তাঁর রোগীর প্রতি, মেষপালকের তার ভেড়ার প্রতি, বা রাখালের তার গরুর প্রতি। তিনি বলেন, কুকুরের কোন অধিকার নেই নিয়মিত পরীক্ষা বা ভেটেনারি চিকিৎসা পাওয়ার তবে আমার দায় আছে তাকে এইসব দেওয়ার। এই দায় তৈরি হয় বিভিন্ন পরিস্থিতি থেকে, হতে পারে মমত্ব বোধ থেকে বা দয়া থেকে কিন্তু অধিকার থেকে অবশ্য নয়। আর এজন্যে গবেষণা কার্যে পরীক্ষন পাত্র হিসেবে প্রাণীর ব্যবহারকে সংকুচিত করতে পারি না। মানুষ নিজে থেকে এইসব কার্যে নিজেকে সংযুক্ত করতে পারে কিন্তু এরুপ ঈচ্ছে প্রাণীদের জন্য অসম্ভব।

টয়েনবির মতে, নৈতিকতা একটি সামাজিক চুক্তি। তিনি মনে করেন, প্রত্যেকটা বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন সত্তাই নিজের সর্বচ্চো স্বার্থ খোঁজে এবং নৈতিকতা গ্রহন করে যদি তা ব্যক্তির জন্য উপযোগিতা বয়ে আনে। এভাবে একজন বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন সত্তা অন্য আরেকজন বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন সত্তার সাথে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে বৌদ্ধিক মনে করে যা অবশ্যই নৈতিক নিয়মের দ্বারা হবে। তারা একে অন্যের জন্য সর্বোচ্চটা দিয়ে কাজ করবে। কিন্তু প্রাণীরা এই সামাজিক চুক্তির ভিত্তি বুঝতে সক্ষম নয়, এমনকি অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেও সক্ষম নয়। সামাজিক চুক্তির সাথে দায়িত্ব জড়িয়ে আছে আর মানুষ অন্যের অধিকারের ব্যাপারেও সচেতন। আর এর আওতায় প্রাণীরা পরে না কারণ মানুষের মতো তারা দায়িত্ব পালনে সক্ষম নয়, আত্মসচেতনও নয়। তাই প্রাণীদের কোন অধিকার থাকতে পারে না বলে তিনি মনে করেন।

প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষ কি আদৌ অন্যের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন হলেই কি সেটা রক্ষা করে সবসময়? যদি তাই হত তাহলে সমাজে এত হানাহানি সংঘটিত হতো না এমনকি এত বিচ্ছেদ বা হাহাকারেরও জন্ম হতো না। নৈতিক বিচারের ক্ষমতা থাকলেই যে মানুষ সবসময় নৈতিকভাবে কাজ করে থাকে তেমনটিও নয়। তাহলে ঘুষ, দূর্নীতি জাতীয় শব্দগুলোর জন্মই হতো না।যদি মানুষ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতো তাহলে এত বৃদ্ধাশ্রম বা শিশুসদন গড়ে উঠতো না। সুতরাং সামাজিক দায়িত্ব, প্রতিশ্রুতি বা অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মানের দোহাই দিয়ে মানুষ ও মানবেতর প্রাণীর মধ্যে সীমারেখা টেনে মানবেতর প্রাণীর নৈতিক অধিকার লঙ্ঘন করা বা সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করা নৈতিক কর্তা হিসেবে একদমই উচিত নয়। উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, অনেক দার্শনিকই স্তরবিন্যাসের আকারে মানুষের স্থানকে উপরে রেখেছে আর মানবেতর প্রানীর নৈতিক মূল্যের ব্যাপারে নারাজ থেকেছেন।

ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রাণীবিদ্যা:

পৃথিবীতে বিচরণশীল প্রাণীসহ সবকিছু মানুষের খাদ্য হবে। প্রাণীর প্রতি নৈতিক আচরণ তা নিয়ে চর্চা বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন ধর্মে মানুষ ও প্রাণীর সম্পর্ক সমন্ধে বিভিন্নরকম মত দিয়েছেন। উৎপাদন ক্ষমতা, খামারে পশুর সংখ্যা বাড়ানো, গবেষণায় পশুদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এইসব ক্ষেত্রে মানুষ ও প্রাণীর সম্পর্কের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। কিছু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাক এই প্রাণীর নৈতিক মর্যাদা কীরকম হওয়া উচিত।

খ্রিস্টধর্মীয় চিন্তাধারাঃ

বাইবেলে সৃষ্টিতত্ত্বের গল্পে মানুষ ও প্রাণীর সম্পর্ক অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ননা করা হয়েছে। এই কাহিনিতে বলা হয়েছে- ঈশ্বর পৃথিবীতে গবাদি পশু, বন্য প্রাণী, চতুষ্পদ প্রাণীর সৃষ্টি করেছে এবং তিনি নিজের

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)
[ISSN-3107-8060]
A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-2, Issue-1, Jan-June' 2026

প্রতিকৃতি অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর বলেছেন সমুদ্রের সকল মাছের উপর, আকাশের সকল পাখির উপর, বিচরণশীল সকল প্রাণীর উপর মানুষ তার আধিপত্য স্থাপন করবে। তাই তিনি নিজের সদৃশ মানুষ সৃষ্টি করেন। এরপর ঈশ্বর মানুষকে আর্শীবাদ করে বলেন, মানুষ বংশবৃদ্ধি করে সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য গ্রহন করবে। পৃথিবী তে বিচরনশীল প্রাণী, জলজ প্রাণী, গবাদি পশু, আকাশের পাখি সকলেই মানুষকে ভয় পাবে এবং মানুষ তাদের দমন করতে পারে।

জৈন, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের চিন্তাধারাঃ

জৈন ধর্মের মতে, পৃথিবীতে উপস্থিত সমস্ত প্রাণী ও বস্তুর মধ্যে প্রাণ রয়েছে। সিন্ধু সভ্যতায় একধরনের চিন্তাধারা উদ্‌ভূত হয়েছিল যে পূর্বপুরুষরা মৃত্যুর পর প্রাণী রুপে আবার ফিরে আসে এবং সেইজন্য প্রাণীদের সাথে অবশ্যই ভালো ব্যবহার করা উচিত। এই বিশ্বাস জৈন ধর্মে ও অন্যান্য দক্ষিন-পূর্ব এশিয় ধর্মে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। প্রাচ্যের ধর্মগুলি মানব-প্রাণী সম্পর্কের দুটি দিককে জোর দেয়-১) জীবিত প্রাণীদের আঘাত না করা (অহিংসা) ২) সমস্ত জীবের পূর্ণজন্ম। অহিংসার মতবাদটি হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নেওয়া হয়েছে। অহিংসা নীতিটির অণুসরণ করা বলতে কঠোর নিরামিষাশীকে বোঝায়। দ্বিতীয়ত মানুষ প্রাণীরূপে ও প্রাণী মানুষরূপে আবার জন্মগ্রহণ করতে পারে। প্রাচ্যের দর্শনগুলি জোর দেয় যে মানুষ ও মনুষ্যতর প্রাণীদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, সকল প্রাণী সমান। সমস্ত প্রাচ্যের ধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্ম প্রাচীনতম। তবে হিন্দুধর্ম অহিংসা সম্পর্কে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মতো কঠোর নয়। হিন্দুধর্মে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে পশু বলিদান স্বীকৃত হয়। হিন্দুধর্মে বলা হয় মানুষের আত্মা অন্যান্য আকারে যেমন পোকামাকড় বা অন্য প্রাণীতে পূর্ণজন্ম হতে পারে। আর এই কারনেই সমস্ত জীবকে সম্মান করা উচিত কারণ শরীর হল বাহ্যিক রুপ মাত্র যা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

ইসলাম ধর্মের চিন্তাধারাঃ

ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ মানুষকে পশুদের উপর ক্ষমতা দিয়েছেন। অতএব পশুদের সাথে খারাপ আচরণ করা আল্লাহর ঈচ্ছাকে অমান্য করা। কোরাণ নির্দেশ করেছে পৃথিবী মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। নবী মুহাম্মদ শিখিয়েছিলেন যে পশুদের হত্যা করা উচিত শুধু প্রয়োজনের জন্য অন্যথা এটি পাপ।ইসলাম ধর্মে পুর্ণজন্মের কোনো ধারণা নেই।

প্রাণীদের প্রতি মানুষের যে অকথ্য অত্যাচার তা দিনদিন মাত্রাতিরিক্ত বাড়ছে যার কারণ হিসেবে বলা যায় মানবকেন্দ্রিকতাবাদ ভাবনা। এখন দেখা যাক মানবকেন্দ্রিকতা বলতে কি বুঝব।

মানবকেন্দ্রিকতাবাদঃ

পরিবেশনীতিশাস্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল মানবকেন্দ্রিকতাবাদ (Anthropocentrism)। মানবকেন্দ্রিকতাবাদ বলতে বোঝায় যেখানে মানুষই যাবতীয় সমস্ত বিষয়ের মূল কেন্দ্রবিন্দু। অর্থাৎ যেখানে মানুষকে কেন্দ্রে রেখে অন্যান্য বিষয়সমূহকে বিচার করা হয়। এখানে কেবলমাত্র মানুষের স্বার্থকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে পরিবেশ প্রকৃতির স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া হয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে শুধুমাত্র মানুষের স্বগত মূল্যের কথাই স্বীকার করা হয় এবং অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীর অস্তিত্বকে মূল্যহীন বলে ঘোষণা করা হয়। তবে একটু বিচার করলে বোঝা যায় মানবকেন্দ্রিক হওয়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষের জন্য স্বাভাবিক। কারন, নিজের প্রজাতির সদস্যদের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়া ততটা খারাপ নয়। অন্যান্য প্রাণীগণ যেমন নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে যত্ন নেয় তেমনি মানুষ তার আত্মীয় স্বজনের বৈধ স্বার্থ পূরণে যত্নশীল হবে এটা খারাপ নয় বরং যথোচিত। মানুষ যদি নিজেকে ভালবাসতে না পারে তাহলে অন্যকেও ভালবাসতে পারবে না। সুতরাং প্রাণীদেরকেও ভালবাসতে পারবে না। তাই বলা যায়, মানবকেন্দ্রিকতাকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা যায় না। তবে

মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সবথেকে খারাপ বা মন্দ 2) মানবীয় দিক হল- ১) প্রজাতিবাদ (Speciesism) স্বাজাত্যাভিমান (Human Chauvinism)। নীচে এই নিয়ে আলোচনা করা হল।

প্রজাতিবাদঃ

মানবকেন্দ্রিকতাবাদের একটি ভয়ংকর দিক হল প্রজাতিবাদ। প্রজাতিবাদ বলতে সেই ধরনের মতবাদকে বোঝানো হয় যেখানে কেবলমাত্র প্রজাতি সদস্যের ভিত্তিতে যে বৈষম্য বা শোষন লক্ষ্য করা যয়। সমাজে যেমন নানারকম শোষণের ঘটনা দেখতে পায় তেমনি প্রজাতির মধ্যে যে বৈষম্য আছে তাও আমরা লক্ষ্য করি। সমাজে যেমন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্গের ভিত্তিতে লিঙ্গগত পার্থক্য আছে, আবার তেমনি শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের মধ্যেও বর্ণের ভিত্তিতে বর্ণগত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। প্রজাতিবাদ হল নিছক মানুষ প্রজাতির সদস্যদের ভিত্তিতে অমানব প্রজাতির ওপর নির্বিচারে শোষন করাকে বোঝায়। যেমন- কোনো মানুষ যদি অন্য মানুষকে শারীরিকভাবে আঘাত দেয় তাহলে তা অন্যায় বলে বিবেচিত হয় কিন্তু মানুষ যদি অন্য প্রজাতির সদ্স্যকে আঘাত করে তাহলে সেটি অন্যায় বলে বিবেচিত হয় না। তাই মনুষ্যেতর প্রজাতির প্রতি মানুষের এই নিষ্ঠুর আচরণ প্রজাতিবাদ বলে বিবেচিত হয়। তাই সমসাময়িক পরিবেশ নীতিবিদরা প্রজাতিবাদকে পরিহারের কথা বলে থাকেন।

মানবীয় স্বাজাত্যাভিমানঃ

মানবকেন্দ্রিকতাবাদের আর একটি আপত্তিকর দিক হল মানবীয় স্বাজাত্যাভিমান। এটি হল একধরনের প্রবণতা, যে প্রবণতার বশবর্তী হয়ে মানুষ নিজের প্রজাতিকে অন্যান্য প্রজাতি থেকে আলাদা করে। অর্থ্যাৎ এখানে মানুষকে একমাত্র সম্মানযোগ্যসম্পন্ন ব্যক্তি বলে বিবেচিত করা হয়। যার দ্বারা বোঝানো হয় মানুষই একমাত্র এর যোগ্য। অন্যান্য প্রানীকে সম্মানের যোগ্য হিসেবে গণ্য করা নাও যেতে পারে কারণ তাদের মধ্যে যুক্তিক্ষমতা, উন্নত ব্যকরণ মেনে ভাষা ব্যবহার করতে পারা, ভবিষ্যত চিন্তা করতে পারা ইত্যাদির অভাব রয়েছে। বলা বাহুল্য, মানবীয় স্বাজাত্যাভিমান প্রজাতিবাদী যুক্তিকে শক্তিশালী করে তোলে। তাই এই একপেশে মতবাদ মানবকেন্দ্রিকতাবাদের সবথেকে ক্ষতিকর মতের একটি, তাই তা পরিহার করা দরকার।

মানুষ মানবকেন্দ্রিকতাবাদকে পরিহার করতে না পারলেও প্রজাতিবাদকে পরিহার করা সম্ভব। আর আমাদের উচিত এই প্রজাতিবাদকে পরিহার করার চেষ্টা করা। কারণ, মানবেতর প্রাণীকে নৈতিক বিবেচনাভুক্তকরণ শুধু পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, বাস্তুতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য নয়; মানবেতর প্রাণীর ন্যায্য অধিকার রয়েছে বিলাসদ্রব্য বা বিনোদনের জন্য অর্থনৈতিকভাবে ব্যবহার না হওয়ার। তবে যেসব ক্ষেত্রে সভ্যতার সংকটে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেইসব দিককে অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।

সমাপনী মন্তব্য:

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, অনেক দার্শনিকই স্তরবিন্যাসের আকারে মানুষের স্থানকে ঊর্ধে রেখেছেন আর মানবেতর প্রাণীর নৈতিক মূল্যের ব্যাপারে নারাজ থেকেছেন। মানবেতর প্রাণীর হত্যা করা অবশ্যই গর্হিত অপরাধ এবং এইসব থেকে বিরত থাকতে হবে। প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ কোনোমতেই কাম্য নয়। মানবেতর প্রাণীর প্রতি আমাদের নৈতিক আচরণ করতে হবে তা নাহলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সাথে সাথে পৃথিবী মানুষ বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পরবে। আমরা জানি, মানবেতর প্রাণী থেকে শুরু করে পৃথিবীর প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবই মানুষের কল্যানে ব্যবহৃত হয়। যেমন; ব্যাং বিভিন্ন কীটপতঙ্গ খেয়ে তাদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রন করে কৃষি অর্থনীতিতে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছে। ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়াসহ বিভিন্ন মশাবাহিত রোগের বাহক মশার লার্ভা ব্যাঙাচি অবস্থাতেই খেয়ে থাকে যা মানবকুলের জন্য আর্শীবাদ স্বরূপ। নির্বিচারে মানবেতর প্রাণী হত্যা করলে জীব বৈচিত্র্য নষ্ট হবে আর

এতে বাস্তুতন্ত্র নিয়ন্ত্রন হারিয়ে মুখথুবড়ে পড়ে পরিবেশের মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনবে। তাই, মানবজাতির স্বার্থের সাথে মানবেতর প্রাণীর প্রয়োজনের জন্য বাস্তুসংস্থানকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে হলেও একজন নৈতিক কর্তা হিসেবে প্রাণীর প্রতি নৈতিক আচরণ করতে হবে।

উল্লেখপঞ্জি:

১. রেগান, টম. দ্য কেস ফর অ্যানিম্যাল রাইটস. ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস, বার্কলে, ১৯৮৩

২. সিঙ্গার, পিটার, অ্যানিম্যাল লিবারেশন, ইউনাইটেড স্টেটঃ হার্পারকলিন্স, ১৯৭৫

৩. সিঙ্গার, পিটার, প্র্যাক্টিক্যাল এথিক্স, তৃতীয় সংস্করণ, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০১১

৪. বেন্থাম, জেরেমি. এন ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য প্রিন্সিপ্যালস অফ মরালস এন্ড লেজিসলেসন, অক্সফোর্ড ক্ল্যারেন্ডন প্রেস, ১৮২৩

৫. ইমানুয়েল কান্ট: লেকচারস্ অন এথিকস্, কেমব্রিজ য়ুনিভার্সিটি প্রেস্, ১৯৯৭

৬.পিটার সিঙ্গার: 'অল অ্যানিম্যালস্ আর ইকোয়াল', স্ব-সম্পাদিত অ্যাপ্লায়েড এথিকস, অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৪

৭. রায়, প্রদীপ, প্রানিমুক্তি: প্রানিমুক্তি আন্দোলনের বিজ্ঞানসম্মত প্রামাণিক ধ্রুপদী গ্রন্থ, প্রথম খন্ড, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০২২

৮. পাল, সন্তোষ কুমার, ফলিত নীতিশাস্ত্র, প্রথম খন্ড, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতাঃ লেভেন্ত বুকস্, জানুয়ারি ২০২১